গিরিশচন্দ্র বসু

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

[বঙ্গবাসী কলেজ ম্যাগাজিনের হীরকজয়ন্তী সংখ্যা থেকে সংকলিত]

মুসলমান শাসনের শেষ দশায় দেশে যে অরাজকতা লক্ষিত হইয়াছিল, তাহার অবসান ঘটিতে অনেক দিন অতিবাহিত হয়। সেই অবস্থার অবসানের পরে দেশে শান্তি স্থাপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য আগ্রহ লক্ষিত হয়। সেই আগ্রহে বাঙ্গালায় বহুজনের সমবেত চেষ্টায় কতকগুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইংরেজ সরকার কলিকাতা, হুগলী, ঢাকা, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানে কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। বাঙ্গালায় যিনি নানা সৎকার্যে অগ্রণী সেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই প্রথম সরকারের সাহায্য নিরপেক্ষভাবে একক উচ্চ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সেই মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশন আজ বিদ্যাসাগর কলেজ নামে পরিচিত। এই কার্যে যাঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপযুক্ত শিষ্য তাঁহাদিগের মধ্যে গিরিশচন্দ্রের নাম সর্ব্বাগ্রে শ্রদ্ধা-সহকারে উল্লেখ করিতে হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন মেট্রোপলিটনের গৃহ নির্ম্মানের সঙ্কল্প করেন তখন সেজন্য, তাঁহাকে বন্ধু নীলমনি মিত্রের মধ্যস্থতায় ঋণ করিতে হইলেও তিনি সব দিক বিবেচনা করিয়া তাহাতেও ইতস্তত করেন নাই। সে বিষয়ে তিনি যে দৃঢ়তা দেখাইয়াছিলেন, গিরিশচন্দ্র তাঁহার উপযুক্ত শিষ্যরূপে তাহার নিদর্শন দিয়া গিয়াছেন।

গিরিশচন্দ্রকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শিষ্য বলিলে গুরু ও শিষ্য কাহারও অগৌরব করা হয় না। কবি হেমচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণনায় লিখিয়াছিলেন—"উৎসাহে গ্যাসের শিখা, দ্রাঘ্যে পাক্ বড়ি!" গিরিশচন্দ্রের সম্বন্ধেও সেই কথা প্রয়োগ করা সঙ্গত। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের

মতোই সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহারই মতো সাদা চাদর ব্যবহার করিতেন।

গিরিশবাবু সরকারের বৃত্তি পাইয়া কৃষিবিদ্যা শিক্ষার্থে ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। ইংরেজ এদেশের বহু সমৃদ্ধ শিল্প রক্ষা না করিয়া নষ্ট করিয়াছিল এবং দেশকে কৃষিপ্রধান হইতে কৃষিপ্রাণ করিলেও কৃষির উন্নতি সাধনের কোন চেষ্টা বহুদিন করে নাই। লর্ড মেয়ো এদেশে বড়লাট হইয়া আসিবার পরে ভারত সরকারের কৃষি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাহার নামকরণেও তৎকালীন সেক্রেটারী অব ষ্টেট ফর ইণ্ডিয়া কৃষি বিভাগের নাম শিল্প ও কৃষি বিভাগ করিয়াছিলেন। আবার বৃত্তি দিয়া কয়জনকে ইংলণ্ডে কৃষি বিদ্যা শিক্ষার্থে পাঠাইতেন। অথচ সে দেশের জলবায়ু, ভূমি, কৃষিপদ্ধতি কিছুই এদেশের মত নহে। শিক্ষার্থীরা ফিরিয়া আসিলে তাঁহাদিগকে শিক্ষিত বিদ্যার অনুশীলনের কোন সুযোগ দেওয়া হইত না। এইজন্য অতুলকৃষ্ণ রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতি আসিয়া ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ লইয়া ছিলেন। গিরিশচন্দ্র তখন ইচ্ছা করিলেই সরকারী চাকুরী পাইতেন। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। তিনি স্বাধীনভাবে কাজ করিতে দৃঢ় সংকল্প হইয়া আসিয়াছিলেন এবং কর্ম্মপন্থাও স্থির করিয়াছিলেন। এদেশে তখনও উচ্চ শিক্ষার অভাব লক্ষ্য করিয়া তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত কলেজ প্রতিষ্ঠা করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। "বঙ্গবাসী কলেজ" সেই সংকল্পের ফল।

গিরিশচন্দ্রের দেশপ্রেম ও দেশসেবার আগ্রহ অসাধারণ ছিল, ইংরেজ এদেশে যেভাবে তাহার রাজনীতিক শক্তি প্রযুক্ত করিয়া ভারতবাসীর অপকার করিয়াছেন তাহা তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সেই জন্যই তিনি তাঁহার আত্মীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর পত্র "বঙ্গবাসীর" জন্য ফরাসী লেখক ম্যাক্স ও বেলের 'জন বুল এণ্ড হিস্ আইল্যাণ্ড' পুস্তকের বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন, ম্যাক্স ও বেলের পুস্তকের ভাব বুঝিবার পক্ষে নিম্নে উদ্ধৃত কয় ছত্রেই বুঝিতে পারা যায়—

"An Englishman was one day swaggering before a Frenchman about the immensity of the British Empire. and he concluded his remarks by saying, 'Please remember my dear Sir that the sun never sets on the possession of the English.' 'I am not surprised at that,' replied the good Frenchman, 'The sun is obliged to always keep an eye on the rascals.'

গিরিশবাবুর এই অনুবাদ পাঠক সমাজে "বঙ্গবাসীর" আদর বিশেষ বর্দ্ধিত করিয়াছিল। যে মনোভাবহেতু তিনি ঐ পুস্তকের অনুবাদ করিয়াছিলেন, সেই মনোভাবের পরিচয় তাঁহার জীবনে সকল কার্য্যে পাওয়া গিয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৌহিত্র 'সাহিত্য' পত্রের সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি বলিয়াছেন,—"গিরিশবাবু যখন ইংলণ্ড হইতে ফিরিলেন, তখন বাড়ীতে তাঁহার স্থান হইল না—সে অনেক দিনের কথা, তখন কালাপানি পার হওয়া ধর্ম্মের নামে প্রচলিত আচারের বিরোধী ছিল, তাই তিনি উঠিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ীতে; তথায় মিথ্যা বিচারের বালাই ছিল না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গৃহিণী আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'গিরিশ কি খাবে?' তাঁহার বোধ হয় মনে হইয়াছিল, নানা বিদেশী খাদ্যে অভ্যস্ত গিরিশচন্দ্রের বাঙ্গালীর 'ডাল ভাত' খাইতে কষ্ট হইবে। সেইজন্য সেই স্নেহশীলা গৃহিণী ঐ প্রশ্ন করিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্র তাহাতে উত্তর দিয়াছিলেন, 'কলাইয়ের ডাল আর ভাত।'—আর সঙ্গে 'গুড় অম্ল' আর টিক অম্ল।"

এই সুরেশবাবুর সূত্রেই আমার সহিত গিরিশবাবুর প্রত্যক্ষ পরিচয়, গিরিশবাবুর পত্নী টেনিসনের কতকগুলি কবিতার বাংলা কবিতায় অনুবাদ করিয়াছিলেন—সে সকলের মধ্যে 'এনক আর্ডেন' অন্যতম। সুরেশবাবু একদিন কয়খানি খাতা—পাণ্ডুলিপি আনিয়া বলিলেন, "হেমেন্দ্রবাবু আমার নীরু মাসি, টেনিসনের কবিতা অনুবাদ ক'রেছেন—একবার দেখে দিতে হবে।" সুরেশবাবু নীরু মাসির পরিচয় দিলেন, "বঙ্গবাসী কলেজের গিরিশবাবুর

স্ত্রী।" সে কালের সম্বন্ধ—তখন পিতা, পিতৃব্য, পিতামহ মাতামহ—ইহাদিগের সহিত পরিচিতদিগের পরিবারের সঙ্গে লোকের সম্বন্ধ এইরূপ ছিল। সেইজন্য বর্দ্ধমানের সম্পর্কে 'নীরু মাসি' সুরেশবাবুর মাতা ভীমরাণীর ভগিনী—সুরেশ বাবুর মাসি। তখন "সাহিত্য" যন্ত্র সুরেশ বাবুর বাড়ীতে—'সাহিত্য' কার্য্যালয় আমার বাড়ীতে। ১৩০৫ বঙ্গাব্দে কবিতাগুলি "ছায়া" নামে প্রকাশিত হয়—তাহা "সাহিত্য" যন্ত্রে মুদ্রিত হয়। পুস্তকের ভূমিকায় লিখিত ছিল—

"শ্রীযুক্ত বাবু হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ 'অনিল' ও অন্য দু-একটি কবিতার পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করিয়া দিয়াছেন—তজ্জন্য তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম"।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ডিসেম্বর পুস্তকখানি আমাকে উপহার দিবার জন্য সুরেশবাবুকে সঙ্গে লইয়া গিরিশবাবু আমার বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার পরে নানা স্থানে নানা উপলক্ষে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে। নানা বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল। সকল সময়েই তাঁহার স্বদেশী ভাব তাঁহার বৈশিষ্ট্য বলিয়া মনে হইয়াছে।

সংবাদপত্রের সহিত গিরিশবাবুর প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ ছিলনা বলিলেই হয়। পরোক্ষভাবে তিনি তাঁহার আত্মীয় যোগেন্দ্রচন্দ্রের "বঙ্গবাসীর" সহিত সম্পর্ক ছিল—যোগেন্দ্র বাবু নানা বিষয়ে তাহার মত লইতেন। "যোগেন্দ্রবাবুর মৃত্যুর পরে তাঁহার নাবালক পুত্রদিগের জন্য কিছুদিন গিরিশবাবুকে "বঙ্গবাসী" পরিচালনা ও পরিদর্শনের ভার লইতে হইয়াছিল। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে যোগেন্দ্র বাবু "টেলিগ্রাফ" দৈনিক পত্র প্রচার আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহা প্রতিদিন অপরাহ্নে প্রকাশিত হইত—মূল্য এক পয়সা ছিল: যোগেন্দ্রবাবু পাকা ব্যবসায়ী ছিলেন—লোকসান দিয়া কাগজ চালাইয়াছিলেন, দৃঢ় বিশ্বাস ছিল উহা লাভজনক হইবে। গিরিশবাবু মনে করেন, যোগেন্দ্রবাবুর নাবালকদিগের পক্ষে লাভের আশায় লোকসান দেওয়া সঙ্গত নহে। সে জন্য তিনি 'টেলিগ্রাফ' বন্ধ করিয়া দেন।

'টেলিগ্রাফ্'-এ যাঁহারা সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখিতেন আমি তাঁহাদিগের অন্যতম ছিলাম। যোগেন্দ্রবাবুর মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি আমাকে এক পত্রে 'টেলিগ্রাফ' সম্বন্ধে তাঁহার পরিকল্পনা জানাইয়াছিলেন। সেই পত্র লইয়া গিরিশবাবুর সহিত আমার আলোচনা হয়।

গিরিশবাবুর যে দেশ সেবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার বৃটেনে অবস্থিতিকালে প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা তাঁহার জীবনের কার্য্যে প্রেরণা হইয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কত দরিদ্র ছাত্র যে তাঁহার বদান্যতায় বঙ্গবাসী কলেজে বিনা বেতনে বা অর্দ্ধ বেতনে শিক্ষালাভের সুযোগ পাইয়াছিল, তাহা অনেকে জানেন না। কিন্তু তিনি কলেজে গ্রহণ না করিলে কত ছাত্রের লাঞ্ছনার অন্ত থাকিত না, তাহা অনেকে কল্পনাও করিতে পারেন না। 'স্বদেশী আন্দোলন' নামে যে স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচিত, তাহার দার্শনিক ও প্রচারক অরবিন্দ তাঁহার বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। "বন্দেমাতরমের" বিরুদ্ধে বাঙ্গালা সরকার মামলা উপস্থাপিত করিয়া যখন অরবিন্দকে গ্রেপ্তার করেন তখন যে দুইজন জামিন হইয়া তাহাকে মুক্ত করেন, গিরিশবাবু তাঁহাদের অন্যতম। সে কথা স্মরণ করিবার বিশেষ কারণ আছে। সে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ১৩ই আগষ্টের কথা। অরবিন্দ যে রাজনৈতিক দলের অন্যতম নেতা সেই দল সরকারের বিরাগভাজন—বৃটিশ আমলাতন্ত্র সেই দল দলিত করিতে কৃতসংকল্প। সেইজন্য দেশের "বিজ্ঞ" ও ধনীরা সে দলের সহিত সম্পর্ক স্বীকার করিতে ভীতি অনুভব করেন। সেই সময় পুলিশ "সঞ্জিবনী" সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্রের ও 'কুন্তলীনের' হেমেন্দ্রমোহন বসুর জামিনে অরবিন্দকে মুক্তি দিতে অস্বীকার করিলে, যে দুইজনের জামিন পুলিশ অগ্রাহ্য করিতে পারে নাই—গিরিশ বাবু তাঁহাদের একজন।

সমাজে সুপরিচিত কোন ব্যবসায়ী আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, বিপ্লবী দলে যোগদান করায় তিনি যে কলেজের ছাত্র ছিলেন, সেই কলেজের অধ্যাপক তাঁহাকে কলেজ ত্যাগ করিতে পরামর্শ দেন—নহিলে তাঁহাকে বিতাড়িত করা হইবে এবং তাহা হইলে পুলিশ তাহাকে ছাড়িবে না!

অনন্যোপায় হইয়া তিনি সে কলেজ ত্যাগ করেন। তাহার পর তিনি যখন বঙ্গবাসী কলেজে প্রবেশ করিবার অনুমতি চাহেন· তখন গিরিশবাবু তাঁহাকে একান্তে ডাকিয়া তাঁহার পূর্ব্বের কলেজ ত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তিনি উত্তর দিতে ইতস্তত করিতে থাকিলে গিরিশবাবু বলেন, "সত্য কথা বল—কোন ভয় নাই।" তিনি তখন কারণ ব্যক্ত করিলে গিরিশবাবু যাহা করিয়াছিলেন, তাহা বলিতে বলিতে পরিণত বয়সেও তাঁহার চক্ষু অশ্রুসজল হইয়াছিল। গিরিশবাবু বলেন—"এখনও দেশের জন্য বিপদের মুখে যেতে পারিস?" তিনি বলেন, "হ্যাঁ"—। গিরিশবাবু সস্নেহে তাঁহার পিঠে করতল স্থাপন করিয়া বলেন, "আমার কলেজে তোকে ভর্ত্তি করলাম। কিন্তু আমার কাছে প্রতিজ্ঞা কর দেশকে মৃত্যু পর্য্যন্ত সমান ভালবাস্‌বি।" কত ছাত্রকে তিনি এই উপদেশ দিয়া উচ্চ শিক্ষালাভের সুযোগ দিয়াছিলেন তাহা কে বলিতে পারে?

গিরিশবাবু কি ছিলেন, দেশের কিরূপ ভক্ত সন্তান ছিলেন, তাহা এই ঘটনা হইতেই বুঝিতে পারা যায়। এইরূপ সন্তানের জননী বলিয়াই বাঙ্গালা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব করিয়াছে। গিরিশবাবু গৃহী, সংসারী, সংসারে সাফল্যলাভের জন্য যশস্বী। তিনি যে আদর্শের অনুসরণ করিয়াছিলেন, সেই আদর্শ সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন:—

"অন্যায় ক'রো না অন্যায় ক'রো না। যথাসাধ্য পরোপকার কর। .....মহাউৎসাহে অর্থোপার্জ্জন করে, স্ত্রী, পরিবার দশজনকে প্রতিপালন, দশটা হিতকর কার্য্যানুষ্ঠান ক'রতে হবে। এ না পার্‌লে তুমি কিসের মানুষ?"

গিরিশবাবু ঠিক এই আদর্শে মানুষ ছিলেন। তাঁহার মত সরল সবল মানুষ যদি দেশমাতৃকার আশীর্ব্বাদে বাঙ্গলায় অনেক দেখা যায় তবে বাঙ্গালার উন্নতি সম্বন্ধে আমরা আর সন্দেহ করিব না।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত তিনি প্রকৃত শিক্ষক ছিলেন। বিদেশীর প্রভাবপূর্ণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে উল্লেখযোগ্য সম্মান দেন নাই। কেন না, তিনি কখন স্বার্থ সন্ধান করেন নাই, কখন কাহারও তোষামোদ করেন নাই। বঙ্গবাসী কলেজ যতদিন তাঁহার আদর্শে প্রভাবিত থাকিবে, ততদিন তাহা বাঙ্গালীর আদরের, আপনার, গৌরবের, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলিয়া বিবেচিত হইবে। বাঙ্গালীর শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাসে গিরিশচন্দ্রের কার্য্য চিরস্মরণীয় থাকিবে।

আর তাঁহাকে—

"যতনে রাখিবে বঙ্গ মনের ভাণ্ডারে ;
রাখে যথা সুধাতে চন্দ্রের মণ্ডলে।"